বিদেশি মুদ্রা সংগ্রহের সুযোগ সীমিত। এই অবস্থায় শিল্পায়নই যুক্তিসংগত পথ। বাস্তবিকপক্ষে, এমন সব শিল্প গড়ে তোলা উচিত যেগুলি প্রকৃতিতে আমদানি পরিহারকারী (import substituting)। ফলে শুধুমাত্র শিল্পজ পণ্যের আমদানিই যে হ্রাস পাবে তা নয়, এর রপ্তানি চাহিদাও বেড়ে যাবে।

পরিশেষে, দেশের নিরাপত্তার তাগিদেও শিল্পায়ন একান্ত জরুরি। প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তুলতে হলে শিল্পের অগ্রগতি প্রয়োজন। এ ব্যাপারে বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা নিতান্ত মূর্খামি ছাড়া আর কিছু নয়। মোট কথা, শিল্পায়নের মাধ্যমে একটি দেশ প্রতিরক্ষা শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

তাহলে দেখা গেল যে উন্নত, স্বল্পোন্নত প্রতিটি দেশেই শিল্পোন্নয়ন প্রয়োজন। তবে, এর অর্থ এই নয় যে কৃষি, এই প্রাথমিক ক্ষেত্রকে উপেক্ষা করে শিল্পোন্নয়ন ঘটাতে হবে। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। কৃষির উন্নয়ন যেমন শিল্পোন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করে, তেমনি শিল্পায়নও কৃষির অগ্রগতির সহায়ক।

১৬.২ পরিকল্পনাকালে ভারতের শিল্পোন্নয়নের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (A Brief Review of India's Industrial Development during the Plan Period)

ভারতীয় শিল্পে সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ধরনধারণ তথা সরকারের শিল্পনীতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে হলে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই শিল্পের মানচিত্রটি তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে এখানে।

প্রথমত, এই সময়ে শিল্পকাঠামোটি ছিল অত্যন্ত অনুন্নত ধরনের। এর সাথে যুক্ত ছিল দুর্বল শিল্প পরিকাঠামো। এই সময়ে সরকার কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন করে।

দ্বিতীয়ত, কার্যত সরকার শিল্পোন্নয়নের ওপর বিশেষ গুরুত্ব না দেওয়ায় এবং শিল্পোন্নয়নে সরকারি ভূমিকা নগণ্য থাকায় ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

তৃতীয়ত, রপ্তানির ধাঁচটি ভারতীয় শিল্পের স্বার্থবিরোধী ছিল।

চতুর্থত, শিল্পের মালিকানা অতিমাত্রায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক ছিল।

পঞ্চমত, কারিগরি ও পরিচালনগত দক্ষতার অপ্রাচুর্য এই সময়কার শিল্পোন্নয়নের অন্যতম বিশেষত্ব।

এই পরিস্থিতির সংশোধন করা হবে বলে ১৯৪৮ সালে ঘোষিত হল সরকারের শিল্পনীতি। শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে শিল্প নিয়ন্ত্রণের জন্য লাইসেন্স প্রথার প্রবর্তন করা হল। শিল্পোন্নয়নে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগদান হল স্বীকৃত। শিল্প-অভিমুখী নানাবিধ সরকারি নিয়মনীতি ঘোষিত হতে লাগল। কিন্তু, বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় যাতে ভারতীয় শিল্প বিপর্যস্ত হয়ে না পড়ে সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় শিল্পকে সংরক্ষণের ছত্রছায়ায় আনা হল। এই সময়কার নীতিটি শিল্পোন্নয়নে আমদানি পরিবর্ততার কৌশল (import substituting strategy) নামে পরিচিতি লাভ করে। ভারতীয় শিল্পকে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণজালে জড়িয়ে ফেলার নীতির দুর্বলতা ক্রমশ পরিস্ফুট হতে থাকায় ১৯৮০-র দশকে নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা আনা হয়। ১৯৯১ সালের পর ভারতীয় শিল্প ক্রমশ নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে উঠল। এই সময়কার উন্নয়ন কৌশলে উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়নের দিকগুলি স্বীকৃতি পেল। ভারতীয় শিল্প আজ অনেক বেশি খোলামেলা ও উন্মুক্ত। নতুন শিল্প-নীতি রপ্তানি সম্প্রসারণের মাধ্যমে শিল্পোন্নয়নের কৌশল নামে পরিচিতি লাভ করল। মোট কথা, ১৯৫০-১৯৯০ সালের শিল্পনীতি থেকে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি সরে এসে সরকার ১৯৯১ সালের পর থেকে নতুন অর্থনৈতিক সংস্কারে দাওয়াই দিলেন। এই অর্থনৈতিক সংস্কারের মূলমন্ত্র হল উদারীকরণ, বেসরকারিকরণ ও বিশ্বায়ন (liberalisation-privatisation-globalisation বা সংক্ষেপে LPG)।

এসবের ফলশ্রুতি হল শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতি। মোট জাতীয় উৎপন্নে শিল্পের অবদান ১৫ শতাংশ (১৯৫০-৫১) থেকে বেড়ে প্রায় ২৪ শতাংশ (২০০৮-০৯) হয়েছে, যদিও শিল্প বিকাশের হার যথেষ্ট পর্যাপ্ত নয়। ভারতীয় শিল্প বর্তমানে খুব উন্নত না হলেও পশ্চাৎপদ নয়। পরিকল্পনাকালে শিল্পের অগ্রগতি নিঃসন্দেহে উৎসাহব্যঞ্জক। ১৯৫১-৫২ থেকে ২০০৮-০৯ সাল পর্যন্ত শিল্পের গড় অগ্রগতির হার ৬ শতাংশেরও বেশি হয়। আমরা এখন প্রথম পরিকল্পনা থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভারতীয় শিল্পের অগ্রগতির একটি ছবি তুলে ধরব। শিল্পোন্নয়নের বিকাশের হার, ধরনধারণ এবং কাঠামোগত পরিবর্তনের আলোচনা বর্তমান অংশে আলোচিত হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনা (১৯৫১-৫৬) : প্রথম পরিকল্পনায় কৃষির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। তাই কৃষিক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণও ছিল সর্বোচ্চ। এই পরিকল্পনার প্রাক্কালে পাট, তুলাবস্ত্র ও চিনি শিল্পের মতো কৃষিভিত্তিক শিল্প এবং লবণ, চামড়াজাত পণ্য, কাগজ শিল্পের মতো গুটিকয়েক ভোগ্যপণ্যের শিল্প ব্যতীত কোনও আধুনিক শিল্পের অস্তিত্ব ছিল না বললে অত্যুক্তি হয় না। এই পরিকল্পনায় শিল্প প্রসারের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় বেসরকারি উদ্যোগের ওপর। এই সময়ে শিল্পোন্নয়নের ওপর পর্যাপ্ত গুরুত্ব না দেওয়া হলেও শিল্পের অগ্রগতি যথেষ্ট সন্তোষজনক হয়। এই সময়ে শিল্পের গড়পড়তা বার্ষিক উন্নয়নের হার ৬.৫ শতাংশ হয়।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা (১৯৫৬-৬১) : দ্বিতীয় পরিকল্পনায় অবশ্য সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। স্থির করা হল যে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশে মূলধনি দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। পরিকল্পনা কমিশনের এই সিদ্ধান্তই *মহলানবিশ কৌশল* (Mahalanobis strategy) নামে অভিহিত। এই কৌশল বা দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত হয় পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পের ওপর গুরুত্ব আরোপে। মূলান্ত বিচারে এটা হল পরিকল্পনায় বিনিয়োগের সর্বাধিক পরিমাণ 'যন্ত্রপাতি উৎপাদনের উদ্দেশ্যে যন্ত্রপাতি উৎপাদনে' বরাদ্দ করা। অর্থাৎ, এই সমস্ত যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী শিল্পই মূল ও ভারী শিল্প নামে অভিহিত। শিল্পায়নের সুদৃঢ় ভিত নির্মাণের লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই পরিকল্পনায় মূল ও ভারী শিল্পের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্রুতহারে শিল্পোন্নয়নের লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে ১৯৫৬ সালে সরকার দ্বিতীয় 'শিল্পনীতি' ঘোষণা করে। এই শিল্পনীতিতে সরকারি উদ্যোগাধীন ক্ষেত্রের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্বের কথা বলা হয়।

শিল্পোন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পনায় প্রকৃতপক্ষে ১,৫৭০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। এর মধ্যে সরকারি উদ্যোগাধীন শিল্পের ক্ষেত্রে ৭২০ কোটি টাকা এবং অবশিষ্টাংশ বেসরকারি শিল্পের ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। সরকারি উদ্যোগে দুর্গাপুর, রাউরকেল্লা ও ভিলাইয়ে তিনটি বৃহৎ ইস্পাত কারখানা স্থাপন এবং মহীশূরের লৌহ ও ইস্পাত কারখানার উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্য স্থির করা হয়। এছাড়া, কয়লা, সার, ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, ভারী বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির গোড়াপত্তন বা প্রসারের ব্যবস্থা করা হয়। এসবের ফলে দেশের শিল্পকাঠামোতে যেমন পরিবর্তন আসে তেমনি শিল্পের বৈচিত্র্যসাধনও ঘটে। এই সময়ে শিল্পোন্নয়নের হার ৭.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। তুলনামূলকভাবে, ভোগ্যদ্রব্য শিল্প পিছিয়ে পড়ে। শিল্পকাঠামোর এ ধরনের পরিবর্তন নিঃসন্দেহে কাম্য।

তৃতীয় পরিকল্পনা (১৯৬১-৬৬) : তৃতীয় পরিকল্পনার অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল যাতে আগামী ১৫ বছরের মধ্যে দ্রুত শিল্পায়নের প্রয়োজনীয় উপকরণ দেশের অভ্যন্তরেই পাওয়া যায় তার জন্য ইস্পাত, রাসায়নিক শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প, শক্তি ও জ্বালানি উৎপাদন ইত্যাদি শিল্পের প্রয়োজনীয় পরিমাণে সম্প্রসারিত করা। অর্থাৎ, এই পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে শুধুমাত্র মূল শিল্প বা মূলধনি শিল্পের ওপরই জোর দেওয়া হয়নি। শিল্পোন্নয়ন স্বয়ংপোষিত করার উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক পরিকাঠামো বা বহিরঙ্গ স্থাপনেও (যেমন, বিদ্যুৎ, পরিবহন ইত্যাদি) সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মতো তৃতীয় পরিকল্পনাতেও সরকারি উদ্যোগকে পর্যাপ্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাই, এই পরিকল্পনাতে শিল্পের মোট ব্যয়বরাদ্দের ২,৭২০ কোটি টাকার মধ্যে সরকারি ক্ষেত্রে বিনিয়োগের পরিমাণ ধার্য করা হয় ১,৫২০ কোটি টাকায়। শিল্পক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৭ শতাংশ। কিন্তু, এই পরিকল্পনাকালে শিল্পের প্রকৃত অগ্রগতির হার হয়।

চতুর্থ পরিকল্পনা (১৯৬৯-৭৪) : বিশেষ কয়েকটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটার জন্য নির্দিষ্ট সময়ে চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু করা যায়নি। ১৯৬৬-৬৯ এই বছর তিনটিতে বার্ষিক পরিকল্পনা (Annual Plans) গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, চতুর্থ পরিকল্পনা শুরু হল ১৯৬৯ সালে। আশা করা হয়েছিল, এই পাঁচ বছরে ৮-১০ শতাংশ হারে শিল্পের অগ্রগতি ঘটবে। কিন্তু, চতুর্থ পরিকল্পনায় শিল্পোন্নয়নের হার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় কম হয়—৪.২ শতাংশ। মূলধনি শিল্পের অগ্রগতি হয় নিতান্ত হতাশাব্যঞ্জক। এই শিল্পের বার্ষিক অগ্রগতি ঘটে ৫.৯ শতাংশ হারে, যা লক্ষ্যমাত্রার (১৭.১ শতাংশ) তুলনায় অনেক কম। মূল শিল্পের উন্নতিও লক্ষ্যমাত্রা থেকে পিছিয়ে পড়ে।

এই সময়ে শিল্পের স্বল্প অগ্রগতির হারের কারণগুলি হল: (ক) সার ও ইস্পাত শিল্পের মতো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পে উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহারে অক্ষমতা; (খ) শক্তি ও কয়লার দুষ্প্রাপ্যতার ফলে সিমেন্ট, সার, ইস্পাত, তুলাবস্ত্র ও রাসায়নিক শিল্পের উৎপাদনে বাধা; (গ) বিনিয়োগের অপ্রতুলতা; (ঘ) প্রধান প্রধান কাঁচামালের অভাব; (ঙ) শ্রমিক অসন্তোষ ইত্যাদি।

পঞ্চম পরিকল্পনা (১৯৭৪-৭৮) : পঞ্চম পরিকল্পনাকালে (ক) শক্তি, ইস্পাত, কয়লা, সার, খনিজ তেল ইত্যাদি কেন্দ্রস্থলাধিকারী শিল্পের (core sector industries) দ্রুত অগ্রগতি ; (খ) রপ্তানিঘেঁষা ও সর্বসাধারণের ব্যবহার্য ভোগ্যদ্রব্য (mass consumption goods) শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি; (গ) অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদন হ্রাস করা এবং (ঘ) ক্ষুদ্রশিল্পের উন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। এই পরিকল্পনাতে মোট ব্যয়বরাদ্দের ২৫.৯ শতাংশ (অর্থাৎ, ১০,২০১ কোটি টাকা) শিল্পক্ষেত্রে ধার্য করা হয়। চতুর্থ পরিকল্পনার মতো পঞ্চম পরিকল্পনাতেও শিল্পক্ষেত্রের ব্যর্থতা চোখে পড়ে। এই সময়ে শিল্পায়নের লক্ষ্যমাত্রার বার্ষিক হার ৭ শতাংশ হবে বলে আশা করা হলেও কার্যত তা মাত্র ৬.২ শতাংশ হয়। তথাপি, চতুর্থ পরিকল্পনার তুলনায় পঞ্চম পরিকল্পনায় অগ্রগতির হার বেশি হয়।

ষষ্ঠ পরিকল্পনা (১৯৮০-৮৫) : ষষ্ঠ পরিকল্পনাকালে কৃৎকৌশলগত উন্নতি ঘটিয়ে এবং লাইসেন্স নীতির

উদারীকরণের মাধ্যমে শিল্পের বর্তমান উৎপাদনক্ষমতার পূর্ণতম ব্যবহার এবং ভোগ্যদ্রব্য, মধ্যবর্তী পর্যায়ের এবং মূলধনি শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি করে সার্বিক শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্য স্থির করা হয়। এই পরিকল্পনাতে শিল্পখাতে ১৫,০০২ কোটি টাকার (১৩.৭ শতাংশ) মতো ব্যয়বরাদ্দ স্থির করা হয়। শিল্পায়নের বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা ৮ শতাংশে স্থিরীকৃত হয়। কার্যত, শিল্পায়নের অর্জিত বার্ষিক হার দাঁড়ায় ৬.৪ শতাংশে। এই সময়ে কোনও কোনও শিল্পের উন্নয়নের হার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি হলেও (যেমন—পেট্রোলিয়াম, যাত্রী-গাড়ি, মোটর সাইকেল, স্কুটার, টিভি সেট ইত্যাদি) মূল শিল্পের (যেমন—কয়লা, ইস্পাত, সিমেন্ট, চিনি, রেলওয়ে ওয়াগন, সুতিবস্ত্র ইত্যাদি) উন্নয়নের হার লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে ছিল। তবে, 'সূর্যোদয় শিল্প' (sunrise industry) হিসাবে ইলেকট্রনিক শিল্পের অগ্রগতি বিশেষ চোখে পড়ার মতো। মোট কথা, এই সময়ের শিল্পোন্নয়নের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হল শক্তি সংকট, ইস্পাতের জন্য জ্বালানি কয়লার অভাব, পাট শিল্পের কাঁচামালের অভাব, শ্রমিক সংঘর্ষ, চাহিদার অপর্যাপ্তি ইত্যাদি।

সপ্তম পরিকল্পনা (১৯৮৫-৯০) : সপ্তম পরিকল্পনায় শিল্পখাতে ২২,৪৬০.৮৩ কোটি টাকার (১২.৫ শতাংশ) ব্যয়-বরাদ্দ স্থির করা হয়। সমগ্র পরিকল্পনাকালে বার্ষিক শিল্পোন্নয়নের হার ৮ শতাংশ হবে বলে অনুমান করা হয়। এই পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের অর্জিত হার দাঁড়ায় ৮.৫ শতাংশ। এই সময়ে শিল্পের অগ্রগতির মূল কারণ হিসাবে লাইসেন্স নীতির উদারীকরণকেই অন্যতম কারণ বলে অনেকে মনে করেন।

অষ্টম পরিকল্পনা (১৯৯২-৯৭) : উদার অর্থনৈতিক নীতির প্রেক্ষাপটে অষ্টম পরিকল্পনার কার্যকাল শুরু। বর্তমানের অর্থনৈতিক নীতিতে যেহেতু 'বাজার ব্যবস্থার' ওপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেহেতু বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সরকারি ক্ষেত্রের তুলনায় বেসরকারি ক্ষেত্র অধিকতর প্রাধান্য পেয়েছে। তাই, এই পরিকল্পনায় বিদ্যুৎ, খনি, তেল ও কয়লা, পেট্রো-রসায়ন, সার, ভারী মূলধন দ্রব্য, সংসরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে বেসরকারি ক্ষেত্রকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

অষ্টম পরিকল্পনায় শিল্পক্ষেত্রে মোট ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ হল ৪০,৬৭৩ কোটি টাকা। এই সময়ে শিল্পক্ষেত্রের বার্ষিক বৃদ্ধির হার ৭.৪৬ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। সমগ্র অষ্টম পরিকল্পনাকালে শিল্পের অগ্রগতির হার হয় ৭.৬ শতাংশ—সপ্তম পরিকল্পনার তুলনায় অনেক কম। সমালোচকেরা এই মন্দাজনিত পরিস্থিতির জন্য নয়া অর্থনৈতিক নীতিকেই দায়ী করেছেন।

নবম পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২) : নবম পরিকল্পনা-কালে শিল্পক্ষেত্রে বার্ষিক ৮.২ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমান করা হয়। শিল্প বিকাশের এই হারটি অর্জন করার উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত কর্মসূচির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়: (ক) অর্থনৈতিক বহিরঙ্গের পর্যাপ্তি সুনিশ্চিত করতে হবে; (খ) শিল্পের দিক থেকে পশ্চাৎপদ অঞ্চলে শিল্পোন্নয়নের বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে; (গ) দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে শিল্পোন্নয়নের উদ্দেশ্যে বিশেষ একগুচ্ছ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হবে; (ঘ) বি.আই.এফ.আর. (B.I.F.R.)-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ পর্যালোচনা করা হবে এবং দুর্বল শিল্পসংস্থার পুনরুজ্জীবনে এই সংস্থাটিকে আরও বেশি কার্যকর সংস্থা হিসাবে কাজে লাগাতে হবে; (ঙ) আর্থী পুনরুত্থানের যোগ্য নয় এমন ধরনের সরকারি সংস্থাকে উঠিয়ে দিতে হবে; (চ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্পে উন্নত কারিগরি কৌশল প্রবর্তন করে এবং পর্যাপ্ত ঋণ সরবরাহের সুযোগ সম্প্রসারণ করে ওই শিল্পের উৎপাদন ও উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। সমগ্র নবম পরিকল্পনায় শিল্প বিকাশের হার লক্ষ্যমাত্রার অনেক নীচে থাকে—মাত্র ৪.৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে, বিশ্ব অর্থনীতিতে স্বল্প বিকাশের হারের প্রভাবটি ভারতীয় শিল্প বিকাশের হারকে প্রভাবিত করে।

দশম পরিকল্পনা (২০০২-০৭) : দশম পরিকল্পনাকালে শিল্প বিকাশের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০ শতাংশে। এই ক্ষেত্রের ব্যয়বরাদ্দ নবম পরিকল্পনার তুলনায় প্রায় ৩২ শতাংশ বেশি ধার্য করা হয়। শিল্পখাতে ৬৪,৬৫৫ কোটি টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। এই পরিকল্পনার শেষে সামগ্রিকভাবে শিল্প বিকাশের হার লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সামান্য কম হয়—গড়ে ৯ শতাংশের সামান্য বেশি।

দশম পরিকল্পনার প্রথম বছরে শিল্পোৎপাদনের গতি কিছুটা স্তিমিত হলেও পরবর্তী বছরগুলিতে পুনরুত্থানের সবল ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। যেমন, ২০০৬-০৭ সালেই শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির হার ১১.৫ শতাংশ ছাড়িয়ে যায়, যদিও ২০০৭-০৮ সালে তা ৮.৫ শতাংশে নেমে আসে তথাপি, শিল্পের অগ্রগতির হার অনেক বেশি উৎসাহব্যঞ্জক। শিল্পের এই অগ্রগতির পেছনে কয়েকটি কাঠামোগত পরিবর্তনকে দায়ী বলে মনে করা হয় : প্রথমত, সঞ্চয়ের হারের বৃদ্ধি—২৩.৫ শতাংশ (২০০০-০১ সালে) থেকে ৩৭.৭ শতাংশ (২০০৭-০৮ সাল)। উচ্চ সঞ্চয়ের হার বিনিয়োগের হার বৃদ্ধির সহায়ক হয়ে ওঠে। *দ্বিতীয়ত*, ভারতীয় শিল্পজাত পণ্যের রপ্তানিযোগ্যতার সম্প্রসারণ।

একাদশ পরিকল্পনা (২০০৭-১২) : এই পরিকল্পনায় শিল্প বিকাশের হারের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১০-১১ শতাংশে। শিল্পখাতে ব্যয়বরাদ্দের পরিমাণ হল ১,৫৩,৬০০ কোটি টাকা, যা দশম পরিকল্পনার তুলনায় ১৩৮ শতাংশ বেশি, পরিকল্পনার প্রথম বছরেই শিল্প বিকাশের হার হয় ১০.৩ শতাংশ।

২০০৮-০৯ সালে আবার শিল্পের অগ্রগতির ক্ষেত্রে পশ্চাৎমুখিনতা (বৃদ্ধির হার ৩.২ শতাংশ মাত্র) শুরু হয়। এর পেছনে গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলি হল : অপরিশোধিত তেলের অস্বাভাবিক মূল্য বৃদ্ধি, ব্যাংক ঋণের ব্যয় বৃদ্ধি, শিল্পের রপ্তানি আত্তাত্তিকতার অবনতি, নির্মাণ ও গৃহ নির্মাণ শিল্পে মন্দাজনিত পরিস্থিতির আবির্ভাব ইত্যাদি। ২০০৯-১০ সালেও শিল্পের অগ্রগতির হারে ক্রমাবনতি লক্ষ করা যায়। আশা করা হচ্ছে সমগ্র একাদশ পরিকল্পনাকালে শিল্প বিকাশের হার ৮ শতাংশ বা তার সামান্য বেশি হবে।

১৬.৩ পরিকল্পনাকালে শিল্পোন্নয়নের সাফল্য ও ব্যর্থতা (Achievements and Failures of Industrial Development during the Plan Period)

ওপরে পরিকল্পনাকালে ভারতের শিল্পক্ষেত্রের পরিমাণগত পরিবর্তনের কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনাকালে ভারতে শিল্পোন্নয়নের যে প্রচেষ্টা চলেছে তার ফলে শিল্পের উন্নয়নের ধরনধারণে ও শিল্পকাঠামোতে এসেছে পরিবর্তন। পরিবর্তন অবশ্যই যে সবসময়ে কাম্যদিকেই ঘটেছে এমন নয়, কখনও কখনও বিকৃত পরিবর্তনও এসেছে। আমরা প্রথমেই শিল্পক্ষেত্রের যে যে দিকে সাফল্য এসেছে সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব।

সাফল্য : *উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির হার :* সমগ্র পরিকল্পনাকালে (১৯৫০-৫১ থেকে ২০০৮-০৯) শিল্পের অগ্রগতির হার হয় বার্ষিক ৫ শতাংশ। ১৯৫০-৫১ সালের শিল্পোৎপাদনের ক্রমযৌগিক বার্ষিক বৃদ্ধির হারের সূচকসংখ্যা যেখানে ছিল ৫.৭ শতাংশ, তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৯ শতাংশের মতো। শিল্পের অগ্রগতি এই ১৫ বছরে যথেষ্ট সন্তোষজনক হলেও পরবর্তী বছরগুলিতে স্বল্প হয়। যেমন, ১৯৬৬-৭০ সালে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধির হার ছিল ৩.৭ শতাংশ। এই সময়ে ভারতীয় শিল্পে মন্দা আবির্ভূত হয়। ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে শিল্প প্রসারের হারের বৃদ্ধি ঘটলেও মন্দার অবস্থা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়নি। ১৯৮০-র দশকে অবশ্য শিল্পক্ষেত্রে ভালো সাফল্য পাওয়া যায়। এই দশকে শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতির হার হয় বার্ষিক ৭.৭৫ শতাংশ। ১৯৮০-র দশকে শিল্পক্ষেত্রের এই সাফল্যের অন্যতম কারণ হল নতুন অর্থনৈতিক নীতির সার্থক রূপায়ণ। তাই এই সময়ে মূলধন-নিবিড় ও আমদানি-প্রগাঢ় শিল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখতে পাই, যা ভারতীয় অর্থ-ব্যবস্থার সাধ্যের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয়। এ ধরনের উন্নয়নে আবার শক্তির ব্যবহারে প্রাচুর্যও লক্ষণীয়। অথচ, শক্তিক্ষেত্রে আমাদের ব্যর্থতা আছে। এই নতুন অর্থনৈতিক নীতির অন্যতম উপাদান হল লাইসেন্স পদ্ধতির উদারীকরণ, বৃহৎ শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা এবং দ্রুত আধুনিকীকরণের তাগিদে শিল্পের যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল ও কৃৎকৌশল আমদানির ব্যাপারে নানা রকম সুযোগসুবিধা প্রদান ইত্যাদি।

১৯৯০-এর দশকটির প্রথম তিন [illegible] শিল্পোন্নয়নের হারের দৃষ্টিকোণ থেকে বি[illegible] করে না। তবে ১৯৯৫-৯৬ সালে শিল্পের বিকা[illegible] হয়ে ১৩ শতাংশের মতো হয়। কিন্তু, এরপর থেকে বিকাশের হার দ্রুতহারে হ্রাস পেতে পেতে ২০০১-০২ সালে তা ২.৭ শতাংশে নেমে আসে। মোট কথা, ১৯৯০-র দশকে শিল্পের বিকাশের হার ১৯৮০-র দশকের তুলনায় কম হয়। এই সময়ে শিল্পের অগ্রগতির হার হয় বার্ষিক ৬ শতাংশের মতো। চাহিদা ও জোগানের প্রতিবন্ধকতাসহ কাঠামোগত ও চক্রগত ওঠানামাহেতু (কৃষি ও রপ্তানি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য দেখা দেওয়া সত্ত্বেও) শিল্পে মন্দার সমস্যাটি প্রকট হয়ে ওঠে। শিল্পে প্রকৃত বিনিয়োগের হ্রাস, অর্থনৈতিক সংস্কারের উদ্যোগে ভাটা পড়ার মতো অবস্থার সৃষ্টি, ক্রেতার চাহিদার ব্যাপক সংকোচন, পরিকাঠামো-ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, এশিয় সংকট, ফিসক্যাল শৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যর্থতা প্রভৃতি কারণে চাহিদা ও জোগানে প্রতিবন্ধকতা এই সময়ে শিল্পক্ষেত্রের ব্যর্থতার জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। ২০০২-০৩ সালে অবশ্য শিল্প বিকাশের হারের বৃদ্ধি ঘটেছে। এই সময়ে শিল্পোন্নয়নের হার ৫.৭ শতাংশ হয়। ২০০৪-০৫ সাল থেকে এই হারটি বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৭-০৮ সালে ৯.৩ শতাংশ হয়। ২০০৮-০৯ সালে শিল্পের অগ্রগতিতে ৩ শতাংশে পশ্চাদপসরণ লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। ২০০০-০১ থেকে ২০০৯-১০ সালে শিল্প বিকাশের হার দাঁড়ায় ৭.৪ শতাংশে।

জাতীয় আয়ে শিল্পক্ষেত্রের অবদান বৃদ্ধি : শিল্পক্ষেত্রের অগ্রগতির ফলে জাতীয় আয়ে শিল্পক্ষেত্রের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫০-৫১ সালে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপন্নে (GDP) শিল্পের অবদান ছিল ১৪.৯ শতাংশ। ১৯৬০-৬১ সালে ১৮ শতাংশ, ১৯৭০-৭১ সালে ২৩.৬ শতাংশ, ১৯৮০-৮১ সালে ২৩.৬ শতাংশ, ১৯৯০-৯১ সালে ২৫.২ শতাংশ এবং ২০০৯-১০ সালে তা অবশ্য হ্রাস পেয়ে ২০.৫ শতাংশে দাঁড়ায়। ১৯৯০-এর দশকে এবং ২০০০-এর দশকের প্রথমদিকে শিল্পের এই পশ্চাদপসরণ রীতিমতো দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথাপি, পরিকল্পনাকালে শিল্পায়ন ঘটেছে।

সরকারি ক্ষেত্রের ব্যাপক সম্প্রসারণ : প্রাক্-স্বাধীনতা